2 Unit

মানবাধিকার

Human Rights

ভূমিকা

মানবাধিকারকে দুইটি দিক থেকে আলোচনা করা যায় (a) নেতিবাচক দিক ও (b) ইতিবাচক দিক। নেতিবাচক দিক থেকে মানবাধিকার হল—সেইসব অধিকারকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্র কখনো হস্তক্ষেপ করবে না। যেমন পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলা যায়। আর ইতিবাচক দিক থেকে এটা হল সেই সমস্ত অধিকার যেগুলির বাস্তবায়নে রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা নেবে। যেমন– আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের কথা বলা চলে। অনেকের ধারণা এমন যে, মানবাধিকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটা চিরন্তন বিরোধিতা আছে এবং মানবাধিকার সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের দ্বারা লঙ্ঘিত হয়। তবে মানবাধিকার রাষ্ট্রের দ্বারা লঙ্ঘিত হলে ও এটা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয় সামাজিক স্তরে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা। এই কর্ম সম্পাদিত হয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাধ্যমে, সংগঠনের মাধ্যমে, ক্লাবের মাধ্যমে, এমনকি পরিবারের মাধ্যমেও।

প্রাচীন গ্রিসের স্টোইক দর্শনে এবং রোমের আইন ব্যবস্থায় মানবাধিকারের বীজ নিহিত ছিল। তবে ত্রয়োদশ শতকে ইংল্যান্ডে 1215 সালে 'মহাসনদ' বা ***Magna Carta*** গৃহীত হলে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সংকুচিত হতে থাকে এবং মানবাধিকারের জয়যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে 1948 সালের 10ই ডিসেম্বর UNO-এর সাধারণ সভায় গৃহিত হয় বিখ্যাত মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রটি এটাই হলো এর মাইলস্টোন। মানবাধিকার বলতেও সেই সব অধিকারকে বোঝায় যেগুলি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য। জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, ধর্মের অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার, কর্মের অধিকার, অবকাশ যাপনের অধিকার, ভোটদানের অধিকার, সরকারকে সমালোচনার অধিকার ইত্যাদি।

1993 সালে ভারত সরকার প্রণীত 'মানবাধিকার আইন' এ মানবাধিকারের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, মানবাধিকার হল ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদা সংক্রান্ত সেইসব অধিকার যেগুলি ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত এবং ভারতীয় আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। এর উপর ভিত্তি করে ভারতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও অঙ্গরাজ্যের রাজ্যমানবাধিকার কমিশনগুলি গঠিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান–২)

1. ১৯৯৩ সালের 'মানবাধিকার রক্ষা আইন'-এ মানবাধিকারকে কীভাবে সংজ্ঞা করা হয়েছে?

উঃ সাধারণভাবে মানবাধিকার বলতে সেই সব অধিকারকে বোঝায় যা মানুষের ব্যক্তি বিকাশের জন্য অপরিহার্য। ১৯৯৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত 'মানবাধিকার রক্ষা আইনে' বলা হয়েছে, মানবাধিকার হল ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদা সংক্রান্ত সেইসব অধিকার যেগুলি সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত এবং ভারতের আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। অনেক সময় মানবাধিকার বলতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকের অধিকারকে বোঝানো হয়।

2. ভারতীয় সংবিধানের কোন্ কোন্ অংশে মানবাধিকার স্বীকৃতিলাভ করেছে?

উঃ সংবিধানের প্রস্তাবনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার এবং মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অংশে মৌলিক অধিকার নামে সংযোজিত হয়েছে মানবাধিকারের এক বিশেষ অধ্যায়। সংবিধানের চতুর্থ অংশে রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতি নামে বেশ কিছু অধিকার সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া সংবিধানের অন্যান্য অংশে সম্পত্তির অধিকার, ভোটদানের অধিকার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত আছে। সবশেষে, সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর শ্রেণির উন্নতিবিধানের জন্য নানারূপ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

3. ভারতে মানবাধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কী কী কমিশন গঠন করেছে?

উঃ ১) তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য জাতীয় কমিশন, ২) সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশন, ৩) মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশন, ৪) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদি।

4. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে কয়জন সদস্য আছেন এবং কে কে?

উঃ ৮ জন। সদস্য হলেন সুপ্রীমকোর্টের একজন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, হাইকোর্টের একজন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সংখ্যালঘু তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং জাতীয় নারী কমিশনের সভাপতি ও সভানেত্রীগণ।

5. **জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের মনোনীত ও নিযুক্ত করা হয় কীভাবে?**

উঃ সদস্যদের মনোনীত করেন প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে লোকসভার অধ্যক্ষ, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা ও ডেপুটি চেয়ারম্যানকে নিয়ে গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। এই কমিটির সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন।

6. **ভারতের মানবাধিকারের উপযুক্ত বিস্তৃতির জন্য অমর্ত্য সেনের সুপারিশ উল্লেখ কর।**

উঃ এ ব্যাপারে অমর্ত্য সেনের সুপারিশ হল দেশের সার্বিক সাক্ষরতা ও জনচেতনার বিকাশ ঘটানো।

7. **অধ্যাপক আহুজার (R. Ahuja) বিশ্লেষণ অনুযায়ী নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত নির্যাতনগুলিকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায় এবং কী কী?**

উঃ তিন শ্রেণিতে—(১) দৈহিক নির্যাতন (Criminal offence), (২) পারিবারিক নির্যাতন (Domestic violence) এবং (৩) সামাজিক নির্যাতন (Social violence)।

8. **কোন্ কোন্ নির্যাতন দৈহিক নির্যাতনের অন্তর্গত?**

উঃ ধর্ষণ, অপহরণ, খুন ইত্যাদি।

9. **পারিবারিক নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত নির্যাতন কোন্‌গুলি?**

উঃ পণসংক্রান্ত মৃত্যু, স্ত্রীকে প্রহার, যৌন অত্যাচার, বিধবা বা বয়স্কা মহিলার প্রতি অমানবিক ব্যবহার ইত্যাদি।

10. **সামাজিক নির্যাতনের অন্তর্গত কোন্‌গুলি?**

উঃ ইভটিজিং, স্ত্রীলোককে সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করা, যুবতী বিধবাকে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে বাধ্য করা ইত্যাদি।

11. **ভারতে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত কিছু সংস্কারমূলক আইন উল্লেখ কর।**

উঃ (i) নারী ও বালিকাদের নীতি-বিগর্হিত ক্রয়বিক্রয় দমন আইন (১৯৫৬),

(ii) পণপ্রথা উচ্ছেদ আইন (১৯৬১),

(iii) শিশু-বিবাহ প্রতিরোধ আইন (১৯৭৮),

(iv) ধর্ষণ সংক্রান্ত 'ফৌজদারী বিধি সংশোধনী আইন' (১৯৮৩)।

12. **শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নির্যাতনগুলি কয়প্রকারের এবং কী কী?**

উঃ তিনপ্রকারের, যথা—(i) দৈহিক, (ii) যৌনমূলক এবং (iii) মানসিক।

13. বলটন ও বলটন শিশু নির্যাতনের যে সম্ভাব্য পরিণতি বা প্রতিক্রিয়াগুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলি কী?

উঃ আত্ম-অবমূল্যায়ণ (Self-reveluation), পরনির্ভরতা, অবিশ্বাস, পুনঃপুনঃ নিগৃহীত হবার ভয়, জনগণ থেকে দূরে থাকা, মানসিক আঘাত (mental trauma), বিচ্যুত আচরণ, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার সমস্যা (interpersonal problems) ইত্যাদি।

14. শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত দৈহিক নির্যাতনের যে-কোনো চারটি কারণ উল্লেখ কর।

উঃ (i) পিতা-মাতার মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব, (ii) পিতা-মাতার সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের স্বাভাবিক সম্পর্কের অভাব, (iii) পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোগত চাপ এবং (iv) শিশুদের আচার-আচরণ ও কার্যকলাপ।

15. শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যৌন নিপীড়নের কারণগুলি কী?

উঃ (i) নিপীড়নকারীদের আত্ম নিয়ন্ত্রণের অভাব, (ii) মানসিক বিকৃতি, (iii) পরিবারের আর্থিক অনটন এবং (iv) পরিস্থিতিগত সুযোগ।

16. শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মানসিক নির্যাতনের কারণগুলি কী?

উঃ (i) দারিদ্র্য, (ii) মাতা-পিতার নিয়ন্ত্রণের অভাব, (iii) পরিবারের মধ্যে সুস্থ পরিবেশের অভাব এবং (iv) পরিবারের সদস্যদের মাদকাসক্তি।

17. ভারতের মানবাধিকার রূপায়ণের প্রধান অনুঘটক (Catalysts) বা মাধ্যমগুলি কী?

উঃ (i) আদালত, (ii) সংবাদ-মাধ্যম, (iii) বে-সরকারি সংগঠন সমূহ এবং (iv) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

18. ভারতের মানবাধিকার রূপায়ণের অনুঘটক হিসাবে যেসব বে-সরকারি সংগঠন কাজ করে সেগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ কর।

উঃ (i) অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, (ii) দি ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব্ জুরিস্টস্, (iii) হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ এশিয়া ইত্যাদি।

19. মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি এবং সদস্যদের অপসারণ করা যায় কীভাবে?

উঃ প্রমাণিত দুর্ব্যবহার অথবা অক্ষমতার কারণে রাষ্ট্রপতি কমিশনের সভাপতি বা কোন সদস্যকে অপসারণ করতে পারেন। তবে অপসারণের পূর্বে রাষ্ট্রপতি এব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত নিয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি এককভাবে কমিশনের সভাপতি বা কোন সদস্যকে অপসারণ করতে পারেন যদি তিনি– ১) দেউলিয়া হয়ে যান, অথবা ২) অন্যত্র সবেতন চাকরি করেন অথবা, ৩) কার্য সম্পাদনে অক্ষম হন,অথবা ৪) নৈতিক অধঃপতনের কারণে আদালত কর্তৃক দন্ডিত হন।

20. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের উল্লেখ কর।

উঃ ক) মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অবহেলা সম্পর্কে কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

খ) সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপসহ যেসব কারণে মানবাধিকার ভোগের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, সেগুলি খতিয়ে দেখা এবং যথাযথ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করা।

21. পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের প্রথম সভাপতি কে?

উঃ চিত্ততোষ মুখার্জি।

22. টাডা (TADA)-র গোটা কথাটি কী?

উঃ Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act এটি প্রণীত হয় ১৯৮৫ সালে। ১৯৯৫ সালের পর থেকে এই আইনটি অপ্রচলিত।

23. পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন কাদের নিয়ে গঠিত হয়?

উঃ ক) একজন সভাপতি, যিনি কোন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

খ) একজন সদস্য, যিনি কোন হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন অথবা আছেন,

গ) একজন সদস্য, যিনি পশ্চিমবঙ্গের যে-কোন জেলায় জেলা-বিচারক ছিলেন বা আছেন এবং

ঘ) দুজন সদস্য, যাঁদের মানবাধিকার বিষয়ে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আছে।

24. পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন কখন গঠিত হয় এবং এর সদস্য সংখ্যা কত?

উঃ পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয় ১৯৯৫ সালের ৩১শে জানুয়ারি। এর মোট সদস্য সংখ্যা হল ৫।

25. পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের কাজ কী?

উঃ পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের মূল কাজ হল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তা তদন্ত করা এবং রাজ্য-সরকারের কাছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠানো। এছাড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যে ধরণের কাজগুলি করে থাকে, পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনকেও সেইসব কাজ করতে হয়।

26. পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আরও তিনটি রাজ্যের নাম কর যেখানে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে?

উঃ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ ও অসম—এই তিনটি রাজ্যে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে।

27. অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

উঃ প্রথমত, অধিকারের ধারণাটি যতখানি প্রাচীন, মানবাধিকারের ধারণাটি ততখা প্রাচীন নয়। দ্বিতীয়ত, অধিকার শব্দটির চেয়ে মানবাধিকার শব্দটি আরও ব্যাপ অন্যভাবে বলা যায় অধিকার একটি জাতীয় ধারণা, অআর মানবাধিকারের ধারণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয়ই। তৃতীয়ত, নাগরিক অধিকারের মূল রক্ষা কর্তা বিচার বিভাগ, অপরদিকে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় বিচার বিভাগ ছাড় অন্যান্য বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়।

28. বিচারবিভাগ ছাড়া এমন কিছু জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম কর যে মানবাধিকার রক্ষার কাজে সক্রিয় থাকে।

উঃ বিচার বিভাগ ছাড়া মানবাধিকার রক্ষার কাজে সক্রিয় আছে এমন কিছু জাতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে যারা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সক্রিয় থা যেমন ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো, অ্যামনেস্টি ইন্টার ন্যাশনাল, হিউম্যান রাই ওয়াচ এশিয়া, বেড ক্রশ ইত্যাদি।

29. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাটি স্বীকৃতি পায় কত সালে

উঃ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর।

30. ভারতীয় সংবিধানের কোন্ অধ্যায়টিকে মানবাধিকার সংক্রান্ত অধ্যায় বলা যে পারে?

উঃ মৌলিক অধিকারের অধ্যায় যা ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে সংযোজি হয়েছে।

31. মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট কোন্ ধারার আশ্রয় নিতে পারে?

উঃ সংবিধানের যথাক্রমে ৩২ এবং ২২৬ নং ধারার।

32. ভারতে মানবাধিকার আইন কত সালে প্রণীত হয়?

উঃ ১৯৯৩ সালে।

33. ভারতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয় কত সালে?

উঃ ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে।

34. পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয় কত সালে?

উঃ ১৯৯৪ সালে।

35. জাতীয়

উঃ ৮ (আট

36. জাতীয়

উঃ মানবাধি
নিযুক্ত

37. জাতীয়

উঃ সুপ্রীম

38. সভাপ

উঃ ৭০ বছ

39. জাতীয়

উঃ জাতীয়

40. পশ্চিম

উঃ ৬৩টি।

41. "Soc

উঃ রাম অ

42. ভারতে

উঃ ১৯৬১

43. ILO

উঃ Inter

44. ভারত

উঃ শিশু
Regu

45. ভারত

উঃ শ্রীমতী

46. ভারত

উঃ শ্রীমতী

47. প্রথম

উঃ রাজ

35. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যা কত?

উঃ ৮ (আট)

36. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি কার দ্বারা নিযুক্ত হন?

উঃ মানবাধিকার সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন।

37. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?

উঃ সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঙ্গনাথ মিত্র।

38. সভাপতি কত বছর বয়স পর্যন্ত পদে আসীন থাকতে পারেন?

উঃ ৭০ বছর পর্যন্ত।

39. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধান কার্যনির্বাহী কে?

উঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মহাসচিব (Secretary General)।

40. পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৬-৯৭ সালে বন্দিমৃত্যুর ঘটনা ঘটে কয়টি?

উঃ ৬৩টি।

41. "Social Problems in India" গ্রন্থটি কার লেখা।

উঃ রাম আহুজা (Ram Ahuja)-র লেখা।

42. ভারতে পণপ্রথা উচ্ছেদ আইনটি কত সালে প্রণীত হয়?

উঃ ১৯৬১ সালে।

43. ILO-র গোটা কথাটি কী?

উঃ International Labour Organisation.

44. ভারতে শিশুশ্রম বন্ধের উদ্দেশ্য প্রণীত আইনটি কী?

উঃ শিশু শ্রম (নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৬ [Chilf Labour (Porhibition and Regulation) Act 1986]

45. ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী কে?

উঃ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি।

46. ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কে?

উঃ শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনি।

47. প্রথম মহিলা মন্ত্রী (রাজ্যের) কে?

উঃ রাজকুমারী অমৃতা কাউর।

48. লোকসভার প্রথম মহিলা স্পীকার কে?

উঃ শ্রীমতী শান্নো দেবী।

49. প্রথম মহিলা রাজ্যপাল কে?

উঃ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

50. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ভারতীয় মহিলা সভাপতি কে?

উঃ শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত।

51. দিল্লীর সিংহাসনের প্রথম মহিলা সুলতান কে?

উঃ রাজিয়া সুলতানা।

52. ভারতে নারীর অধিকার রক্ষার জন্য যেসব আইন প্রণীত হয়েছে, সেগুলির ম যে-কোন একটির উল্লেখ কর।

উঃ শিশু-বিবাহ প্রতিরোধ আইন (১৯৭৮)।

53. ভারতে 'নারীদের জন্য জাতীয় কমিশন আইন' কত সালে প্রণীত হয়?

উঃ ১৯৯০ সালে।

54. নারীদের বিরুদ্ধে দৈহিক নির্যাতন (Criminal Violence)-এর দুটি উদাহ দাও।

উঃ ১) ধর্ষণ, ২) অপহরণ।

55. নারীদের বিরুদ্ধে পারিবারিক নির্যাতনের দুটি উদাহরণ দাও।

উঃ ১) পণসংক্রান্ত মৃত্যু, ২) স্ত্রীকে প্রহার।

56. নারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক নির্যাতনের দুটি উদাহরণ দাও।

উঃ ১) ইভটিজিং, ২) স্ত্রীলোককে সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করা।

57. ভারতে মানবাধিকার রূপায়ণের যে-কোন দুটি অনুঘটকের নাম কর।

উঃ ১) আদালত, ২) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

58. পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের সদস্য সংখ্যা কত?

উঃ পাঁচজন।

59. ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের সাধারণ কার্যকালের মে কত?

উঃ পাঁচ বছর।

60.

উঃ

61.

উঃ

62.

উঃ

63.

উঃ

64.

উঃ

65.

উঃ

66

উঃ

67

উঃ

68

উঃ

60. ১৪ বছর বয়স্ত-বালক-বালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যমূলক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে?

উঃ ৪৫ নং অনুচ্ছেদে।

61. ১৪ বছরের নীচে বালক-বালিকাদের শিল্পে বা বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে?

উঃ ২৪ নং অনুচ্ছেদে।

62. বর্তমানে পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় স্ত্রীলোকদের জন্য কত সংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উঃ ৩৩ শতাংশ।

63. ভারতীয় সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে মানুষ ক্রয়-বিক্রয় এবং মানুষ নিয়ে ব্যবসা-নিষিদ্ধ করা হয়েছে?

উঃ ২৩ (১) নং অনুচ্ছেদে।

64. ভারতে মেয়েদের বিবাহের বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর করা হয়েছে কোন আইনে?

উঃ শিশুবিবাহ আইন, ১৯২৩।

65. শিশুদের ১২টি অধিকার-সংক্রান্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কনভেনশনে ভারত সরকার কখন স্বাক্ষর করেছে?

উঃ ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে।

66. ভারতীয় ফৌজদারী দন্ডবিধির কত নং ধারায় নির্যাতিত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উঃ ৩৫৭ নং ধারায়।

67. নারীর মানবাধিকার বিরোধী একটি প্রথার নাম কর।

উঃ সতীদাহ প্রথা।

68. নারীর মর্যাদাহানিকর একটি প্রথার নাম কর।

উঃ দেবদাসী প্রথা।

মাঝারি মানের প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান–৫)

প্রঃ মানবাধিকার বলতে কী বোঝ?
[What is Human Rights?]

উঃ বিশ্বজনীন মানবাধিকার নীতি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনগুলির মূল ভিত্তি ১৯৪৮ সালে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বজননীন প্রস্তাবনায় প্রথম এই নীতির কথা বল হয়। পরবর্তী কালে অসংখ্য প্রস্তাবনা, ঘোষণা এবং সনদে এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার সংক্রান্ত ভিয়েনা সম্মেলনের কথা বলা যেতে পারে। যার মূল বক্তব্য ছিল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি বিশেষ মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার রক্ষা এবং বিকাশসাধন প্রতিটি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং কর্তব্য। মানবাধিকার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, কারন মানবাধিকারের কোন দেশ, কাল, ধর্ম প্রথা, শিক্ষা এবং শ্রেণীবিভাজন নেই। সকল ব্যক্তির মৌলিক অধিকার সবক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য এবং সেটি কোনো কারনে লঙ্ঘিত হলে ব্যক্তির স্বাভাবিক মর্যাদার হানি হয় যা কোনো ভাবেই কাম্য নয়। তাই আন্তর্জাতিক স্তরে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তি সমর্থন করেছে এবং স্বাক্ষর করেছে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র। মানবাধিকারের বিভিন্ন দিক ভারতীয় সংবিধানে গুরুত্ব পেয়েছে। সাধারণত মানবাধিকার বলতে এমন কিছু অধিকারকে বোঝায় যা নাগরিকত্ব, বাসস্থান, লিঙ্গ, গোষ্ঠীসত্তা বা ধর্ম-বর্ন-ভাষা বা অন্য যেকোন পরিচয় নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য। কোনো প্রকার ভেদাভেদ ছাড়া সকল ব্যক্তি এই অধিকারগুলি সমানভাবে ভোগ করার অধিকারী। এই অধিকারগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং অবিভাজ্য।

রাষ্ট্রসংঘের আদর্শের প্রতি অনুগত সদস্য হিসেবে ভারত প্রথম থেকেই মানবাধিকার রক্ষায় অঙ্গিকারবদ্ধ। তাই ভারতবর্ষ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকারের বিশ্ব ঘোষণাপত্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই ঘোষণাপত্রের জন্মলগ্নের থেকেই মানবাধিকারগুলি স্বীকৃতি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরের পাশাপাশি অভ্যন্তরিণ ক্ষেত্রেও ভারত মানবিক অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং তাকে সুরক্ষা দিতে প্রয়াস চালিয়েছে। ভারত আজ মানবিক রক্ষার ব্যাপারে এমনই একস্থানে রয়েছে যেদেশে সাধারণ মানুষও এখন তার মানবিক রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরণের আন্দোলন সংগঠিত করতে ও আইনি ব্যবস্থা নিতে তৎপর।

সর্বোপরি মানবাধিকার বলতে বোঝায় সেইসব অধিকারকে যেগুলি মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য অপরিহার্য্য। ১৯৯৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত 'মানবাধিকার রক্ষা আইন' এবং ২(১)(খ) নং ধারায় বলা হয়েছে। মানবাধিকার হল ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য মর্যাদা সংক্রান্ত সেইসব অধিকার যেগুলি ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত অথবা আন্তর্জাতিক যুক্তিপত্রের অঙ্গিভূত ও ভারতের আদালত কর্তৃক বলবাত যোগ্য।

প্রঃ অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য।
[Distinguish between Rights and Humen Righta]

উঃ আসলে অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বললেই চলে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যাকে অধিকার (Right) বলা হয় যেটি মানুষেরই অধিকার। মানুষ দ্বারা অন্য কোনও প্রাণীর বা বস্তুর অধিকারকে বোঝায় না। তাছাড়া স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার প্রভৃতি ধারণাগুলিও মানুষকে কেন্দ্র করেই অবর্তিত হয়ে থাকে। তাই অধিকারও মানবাধিকারের মধ্যে তেমন কোন বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

অধিকার : সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে প্রত্যেক মানুষ চায় তার নিজস্ব গুণের বা ব্যক্তিত্যের বিকাশ ঘটাতে। এরজন্য দরকার হল প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিস্থিতি পরিবেশ। এইসব প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও অবস্থাকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিকার বলে। **অধ্যাপক** Laski – বলেছেন, 'অধিকার হল সমাজজীবনের সেই সকল অবস্থা যেগুলি ছাড়া কোনও মানুষ তার ব্যক্তিত্বের পরমতম বিকাশ ঘটাতে পারে না।' **অধ্যাপক** Barker – বলেছেন, 'অধিকার হল মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সেইসব সুযোগ সুবিধা, যেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়'। মানুষের প্রধান প্রধান অধিকারগুলি হল জীবনের অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার, ভোট দেওয়ার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার, ভোট দেওয়ার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার, সাম্যের অধিকার, সমালোচনার অধিকার, কর্মের অধিকার, তথ্য জানার অধিকার, উপযুক্ত পরিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার খাদ্যের অধিকার ইত্যাদি।

মানবাধিকার : মানবাধিকার বলতে সেইসব অধিকার কে বোঝায় যেগুলি মানুষের ব্যাক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য্য। জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার নিরাপত্তার অধিকার। শিক্ষার অধিকার, ধর্মের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, কর্মের অধিকার, অবকাশ যাপনের অধিকার, ভোটদানের অধিকার, সরকারকে সমালোচনার অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের পৌর, রাজনৈতিক সামাজিক অধিকারসমূহ মানবাধিকারের

মধ্যে পড়ে। ১৯৯৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রনীত। মানবাধীকার রক্ষা আইন
মানবাধীকারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে "মানবাধিকার হল ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য
ও মর্যাদা সংক্রান্ত সেইসব অধিকার যেগুলি ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত বা আন্তর্জাতিক
চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত এবং ভারতীয় আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য।"

উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য সমূহ : অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্যের ক্ষে
বর্তমান। যেমন–

ক) উভয়প্রকার অধিকারই মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন।

খ) উভয় প্রকার অধিকারই সামাজিক ধারণা বিশেষ। সমাজের সদস্যহিসাবেই কেব
মানুষ অধিকারগুলি ভোগ করে থাকে।

গ) উভয় প্রকার অধিকারই রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত।

ঘ) কোনও অধিকারই আবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়। সামাজিক কল্যাণ্যের স্বার্থে রাষ্ট্র
কোনও অধিকারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

ঙ) কোন অধিকারই চিরস্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় নয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে
যে কোন অধিকারের ধারণা পরিবর্তিত হতে পারে।

পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য : অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়
যেমন– ক) অধিকারের ধারণাটি যতখানি প্রাচীন, মানবাধিকারের ধারণাটি ততখানি প্রাচী
নয়। মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা খুবই সাম্প্রতিককালের ঘটনা
মানবাধিকার নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয় ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর UNO ত
সাধারণ সভা সেদিন মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণা পত্রটি গ্রহণ করে।

খ) অধিকার শব্দটির থেকে মানবাধিকার শব্দটি আরো ব্যাপক। অধিকার বল
প্রধানত ব্যাক্তির অধিকারকে বোঝায়। কিন্তু মানবাধিকার রক্ষা কর্মসূচির মধ্যে রাষ্ট্রে
অধিকারের বিষয়টিও জড়িত থাকে। মানবাধিকার ব্যক্তির অধিকার ছাড়াও বিভিন্ন দেশে
অধিকারের প্রশ্ন জরিত থাকে।

গ) বেশিরভাগ দেশেই নাগরিক অধিকারগুলির রক্ষাকর্তা হিসাবে কাজ করে
সমস্ত দেশের বিচার বিভাগ। ভারতের যেমন সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট। কিন্তু মানবাধিক
রক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় বিচারবিভাগগুলি ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা
সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। এই ব্যাপারে ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো, এ্যামনে
ইন্টারন্যাশনাল, হিউমান রাইটস্ ওয়াচ এশিয়া প্রভৃতি সংস্থার উল্লেখ করা যায়।

১৯৯৩ সালে ভারতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কত বিপজ্জনক শিল্প রয়েছে, কত শিশু শ্রমিক কী পরিবেশে কাজ করছে, কত নারী কতভাবে নির্যাতিত হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে এরা অনুসন্ধান চালায় এবং রিপোর্ট তৈরি করে। সর্বপরি যেহেতু যে কোন ও অধিকারের সঙ্গেই সামাজিক কল্যাণের বিষয় জড়িত থাকে। তাই বলা সঙ্গত যে, অধিকার ও মানবাধিকারের তফাত মৌলিক নয় মন্ত্রগত।

প্রঃ ভারতে মানবাধিকার রূপায়নের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি কী ?
[What the hindrances is the implementation of Human Right in India]

উঃ ভারতবর্ষে মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যাবস্থার কোন অভাব না থাকলেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও এখানে কম নয়। নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্য ভারতের স্থান প্রথম দিকে। খবরের কাগজের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে বন্ধু হত্যা, শিশুশ্রম, কন্যাভ্রূণ হত্যা ইদ্যাদির সংক্রান্ত অজস্র ঘটনার বিবরণ। এছাড়া আছে উগ্রপন্থিদের ক্রমবর্ধনমান সন্ত্রাস, হিংসা, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি। এগুলির মোকাবিলায় পুলিশের ভূমিকা ও উদ্বেগজনক আমাদের দেশে লক আপে মৃত্যুর ঘটনা, পুলিশের প্রতিহিংসামূলক আচরণ, দমন, পিড়ন, চিকিৎসালয় অবহেলা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে ভিখন ভাবে বিচলিত করে।

ভারতবর্ষে মানব অধিকার রক্ষার পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতা। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। ভারতবর্ষে এখন মোট প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হল নিরক্ষর। পৃথিবীতে যত নিরক্ষর আছে তার ৪০ শতাংশের বাস এই ভারতবর্ষে। এইসব দরিদ্র এবং অশিক্ষিত মানুষ খুব স্বাভাবিক ভাবেই নানা প্রকারের দমন পীড়ন ও শোষনের শিকার হয়।

আমাদের দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতাটি হল প্রশাসনিক। স্বেচ্ছাচারিতা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। ১৯৯৬-৯৭ সালে শুধু পশ্চিবঙ্গেই মোট ৬৩টি বন্দি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এমনকি মহিলাবন্দিদের ধর্ষন করার অভিযোগ শোনা যায় পুলিশি প্রসাশনের বিরুদ্ধে শুধু পুলিশ প্রশাসন নয়, ভারতের সশস্ত্র বাহিনির বিরুদ্ধেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ শোনা যায়। ১৯৮৭ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে মণিপুরের কয়েকটি গ্রামে আসাম রাইচোলস হত্যা, লন্ঠন, ধর্ষন, অগ্নিসংযোগের মত অমানুষিক তান্ডব চালায়। বস্তুত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ প্রতিরোধের নামে যে রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে তাতে মানবাধিকার কার্যত বিপন্ন হয়ে

পড়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে প্রণীত নির্বতন মূলক আ
আইন গুলির ভূমিকাও কম নয়। এই আইনগুলির অপব্যাবহার ঘটিয়ে বহু মানুষের উ
ও ব্যাক্তিগত স্বাধিনতার অধিকার ক্ষুনরন করা হয়।

ভারতবর্ষের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে নানাবিধ কুসংস্কার ও কুপ্রথার ভূমি
লক্ষ্য করা যায়। এখনও ভারতবর্ষে বহুলোককে ডাইনি সন্দেহে পিটিয়ে মারা হয়। হরিজন
ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়। বহু মানুষকে অস্পৃশ্য করে রাখা হয়। এখনও প
নরবলি সাগরে নদীতে সন্তান বির্সজন প্রভৃতির ন্যায় অমানুষিক ঘটনা ঘটে ভারতীয় সমাজ

এছাড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা, সংরক্ষণ বিরোধি আন্দোলন, ভাষা কেন্দ্রিক স
প্রভৃতি কারনেও ভারতবর্ষে প্রচুর মানুষের জীবন ও সম্পত্তি হানি ঘটে।

ভারতবর্ষে মানবাধিকার রূপায়ণের পথে আইনি জটিলতাকে অনেকে সবচেয়ে
প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করেন। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘ
সংশিষ্ট ব্যক্তিকে আইনের আশ্রয় নিতে হয়। আর এখানেও যত বিপত্তি। প্রথমত, ভারতে
অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র ও অশিক্ষিত। তাদের পক্ষে বিচার ব্যাবস্থার মাধ্যমে নিজে
অধিকাংশ প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব। কারণ এর জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও স
দিতে হয় তার কোনটাই তাদের থাকেনা। তাছাড়া বেশিরভাগ অশিক্ষিত মানুষ জানে

এইসব কারণে ভারতবর্ষে যে পরিমান মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে তার
সামান্য ভগ্নাংশই আদালতের আওতায় আসে। এই অবস্থায় আদালতের বাইরে যে
সংস্থা আইনানুসারে মানবাধিকার রক্ষায় নিযুক্ত হলে সাধারণ মানুষের কাছে তা অ
বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। এই পটভূমিকায় ১৯৯৩ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গ
হয়। গঠিত হবার কয়েক বছরের মধ্যেই এই কমিশন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রশংস
ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে শুধু কমিশন গঠন করলেই সমস্যার সমা
হবে না, এর জন্য দরকার দারিদ্র্যর অবসান, সার্বিক সাক্ষরতা এবং জনচেতনার বিক

প্রঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা আলোচনা কর।
[Role of Human right Commission]

উঃ **ভূমিকা ঃ** জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৩ সালে। কিন্তু এই অল্পদিনের সময়ের মধ্যে এই কমিশন তার কার্যকারিতার দিকটি ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। জের ব্যবস্থার দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা, পুলিশি অত্যাচার, শিশু নির্যাতন, চিকিৎসায় অবহেলা, মহিলাদের সামাজিক সম্মান/মর্যাদা খর্ব করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বহু প্রশ্ন এসেছে কমিশনের কাছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে এবং বিভিন্ন সেমিনার ও বক্তৃতা ইত্যাদির আয়োজন করে কমিশন মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াচ্ছে। এ ব্যাপারে কমিশন অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য পেয়েছে।

কমিশন গঠিত হওয়ার আগে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, এধরণের কমিশন গঠিত হলে হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টের এক্তিয়ার সংকুচিত হবে এবং আদালতের সঙ্গে কমিশন একটি অশুভ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে। সে আশংকা ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং দেখা গেছে যে, মানবাধিকার প্রশ্নে উচ্চ আদালতগুলিতে আবেদনের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। এতে আদালতগুলির চাপ কমেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার কমিশনের কার্যকলাপের দিকে নজর দিলে দেখা যায় ১৯৯৫ সালে কমিশনের অভিযোগ কমে এসে ছিল ৫২৪টি এবং ১৯৯৬ সালে সেই অভিযোগের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৫৭টি।

তবে মানবাধিকার কমিশনের একার পক্ষে সমাজের ক্ষত সারানো সম্ভব নয়। এজন্য দরকার দেশের রাজনৈতিক ও বিভিন্ন স্বেচ্ছসেবী দলগুলির সহযোগীতা। রাজনৈতিক প্রশ্রয় না পেলে সরকারি কর্মচারী খুব বেশি বাড়াবাড়ি করতে পারবে না। কমিশনকে সার্থক করে তুলতে হলে সরকারকে আরও বেশি সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। কমিশনের কাজ হল কোন অভিযোগ সম্পূর্ণ তদন্ত করা এবং এসম্পর্কে নির্দিষ্ট সুপারিশ সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সরকারের উচিৎ সুপারিশকে যথাযথ মূল্য দেওয়া। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সরকার কমিশনের সকল সুপারিশকে সমান গুরুত্বদেয় না। যেমন ১৯৮৫ সালে প্রণীত TADE আইন বাতিল করার জন্য কমিশন বারবার সুপারিশ করা সত্ত্বেও সরকার এই সুপারিশকে গুরুত্ব দেয়নি।

আসলে ভারতের মত জনবহুল বহুত্ববাদী দেশে মানবাধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গেলে প্রয়োজন সার্বিক সাক্ষরতা এবং মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতার প্রকাশ।

প্রঃ রাজ্য মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে আলোচনা কর।
[State Human Rights Commission]

উঃ ভারতীয় সংসদ ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন এবং মানবাধিকার আদালতের উল্লেখ রয়েছে। এই আইনের পঞ্চম অধ্যায়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের ২১নং ধারা অনুসারে যেকোন রাজ্য সরকার নিজে রাজ্যের জন্য একটি মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে পারেবে। সভাপতিসহ মোট (পাঁচ) জন সদস্যকে নিয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। হাইকোর্টের প্রধা বিচারপতি এমন একজন ব্যক্তিকে কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত করেন। তাছাড়া বা ৪জন সদস্যদের মধ্যে– ১) একজন হাইকোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, ২ একজন বর্তমান বা প্রাক্তন জেলা জজ। ৩) মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা ও বাস্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দু-জন ব্যক্তি।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের একজন সচিব থাকেন। সচিবই হন কমিশনের প্রধা কার্যনির্বাহী আধিকারিক সদস্যগণের নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা মানবাধিকার সুরক্ষা আইনে ২২নং ধারায় রয়েছে। রাজ্যের রাজ্যপালের লিখিত সম্মতির ভিত্তিতে এই কমিশনে সভাপতিসহ বাকি ৪জন সদস্য নিযুক্ত হন। তবে এই সদস্যদের অপসারণ সম্পর্কে আইনে উল্লেখ আছে যে, প্রমাণিত অসদাচরণ বা অ-সামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতি সদস্যকে অপসারণ করতে পারেন। মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের ২৪নং ধারায় বলা হয়েছে (কমিশনের সভাপতি নিযুক্তির পরে ৫ বছর অথবা ৭০ বছর বয়স এই দুটির মধ্যে যে কম হয়, সেই সময়ের জন্য সভাপতি নিযুক্ত হবেন। তবে সভাপতিকে পুনরায় নিয়ে করা যাবে না (২৪(১) নং ধারা)। কমিশনের সদস্যদের কার্যকাল ৫ বছর। তবে তাদে পুনরায় নিয়োগ করা যায় আবার ৫ বছরের জন্য।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে ১৯৯৩ সালের আইনে ২৭নং ধারায় বলা হয়েছে, যে– জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতো রাজ্য মানবাধিক কমিশনের কার্যাবলি পরিচালিত হবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতো রা মানবাধিকার কমিশনও দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা উপভোগ করবে। তবে এটি কে সমান্তরাল আদালত নয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতো রাজ্য মানবাধিকার কমিশ অনুসন্ধান পরিচালনা সম্পর্কিত ক্ষমতা উপভোগ করতে পারবে।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান–১০)

প্রঃ ভারতীয় সাংবিধানিক রূপকল্পে মানবাধিকারের ব্যাখ্যা কর।
।। অথবা।। ভারতীয় সংবিধানে বিভিন্ন অংশে উল্লিখিত মানবাধিকার সম্পর্কে আলোচনা কর।
[Human rights in Indian Constitution]

উঃ ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হল ভারতীয় সংবিধান। ভারতীয় শাষনব্যবস্থা কোন নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে এবং কীভাবে চলবে সে সম্পর্কে বিষদভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে এই সংবিদানে। একই সঙ্গে এই সংবিধানের বিভিন্ন অংশে অনেক মানবিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হচে ছ এবং কয়েকটি মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে সংবিধানে কোথাও মানবিক অধিকারের কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। তবে ১৯৪৮ সালে মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে অন্যতম স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র ভারত ১৯৯৩ সালেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন এবং মানবাধিকার আদালত প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুরক্ষা আইন পাশ করে ভারতীয় পার্লামেন্টে। এই আইনে ২ (১) নং ধারায় সর্বপ্রথম মানবিক অধিকারের সংজ্ঞা দেওয়া হয় এবং এই আইনে ৩ (১) নং ধারায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও ২১ নং ধারায় রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। তবে ভারতে মানবাধিকারের ধারণা প্রাচীন কাল থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ়। এর প্রমান পাওয়া যায় বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদ-এ। তাছাড়া বৌদ্ধধর্ম ও মানবাধিকারের সুসম্পর্ক সকলেরই জানা। বর্তমানে মানবাধিকদ্রসার সমূহ আইনি অধিকাররূপে স্বীকৃত।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্বীকৃত মানবাধিকার :

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতীয় নাগরিকদের যেসব মানবিক অধিকারের উল্লেখ রয়েছে সেগুলি হ'ল–

১) সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার।

২) বাক্, চিন্তা, বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতার অধিকার।

৩) সমান সুযোগ সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা লাভের অধিকার।

৪) নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষার অধিকার।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় যেসব মানবিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেগুলি অনেকাংশে বিশ্ব ঘোষণাপত্রে– ১, ২, ৭, ৮ ও ১৯ নং ধারানুযায়ী।

সংবিধানে তৃতীয় অধ্যায়ে স্বীকৃত মানবাধিকার :

সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ৬টি মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এগুলি হ'ল–

১) সাম্যের অধিকার।

২) স্বাধীনতার অধিকার।

৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার।

৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার।

৫) সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার এবং

৬) সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার।

সাম্যের অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে কয়েকটি মানবিক অধিকারকে, যমন- আইনের চোখে সমতার অধিকার, আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার, ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, জন্মস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য না করার অধিকার চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার ইত্যাদি। স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে বাক্ ও মতামত প্রকাশের অধিকার, শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র হয়ে সমবেত হওয়ার অধিকার। সংঘ ও সমিতি গঠন করার অধিকার, ভারতের সর্বত্র চলাফেরার অধিকার, ভারতে যেকোন জায়গায় বসবাস করার ও স্থায়ী নিবাসী হওয়ার অধিকার যেকোন পেশা গ্রহণের অধিকার, এছাড়া ভারতীয় সংবিধানে ২৩ ও ২৪ নং ধারায় সমাজের অসহায় ও দুর্বল মানুষকে শোষণ ও পীড়ন থেকে সুরক্ষা দেওয়ার অধিকার ২৫-২৮নং ধারায় যে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার আছে এবং ২৯ ও ৩০ নং ধারায় সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার রয়েছে সেগুলি বিশ্ব মানবাধিকারে ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সংবিধানের চতুর্থভাগে স্বীকৃত মানবাধিকার :

সংবিধানের চতুর্থভাগে রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতি বর্ণনা দিতে গিয়ে যেসব অর্থনৈতিক অধিকারকে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হ'ল–

১) জাতীয়জীবনের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সুবিচার পাওয়ার অধিকার।

২) উপযুক্ত জীবিকালাভের অধিকার।

৩) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমকাজে সমবেতন পাওয়ার অধিকার।

৪) শিল্প পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের অধিকার। এগুলি আসলে রাজনৈতিক অধিকারকেই স্বীকৃত দেয়। এছাড়াও কয়েকটি সামাজিক অধিকারের উল্লেখ আছে, যেমন—

১) ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা পাওয়ার অধিকার।

২) চোদ্দো বছরের নীচে ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার।

৩) দুর্বল অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের শিক্ষাগত স্বার্থ রক্ষিত হওয়ার অধিকার।

সংবিধানের অন্যান্য অংশে স্বীকৃত মানবাধিকার :

ভারতীয় সংবিধানে তৃতীয়ভাগে যেসব মানবিক অধিকার উল্লিখিত—

এছাড়াও আরও কিছু মানবিক অধিকারকে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের অন্যান্য ধারায়, যেমন- ৩২৬নং ধারানুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়স নয় এমন ভারতীয় নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃত। আবার ৩০০(ক) নং ধারায় স্বীকৃত সম্পত্তির অধিকার, ২৬৫নং ধারা এবং ৩০১ নং ধারার কথা উল্লেখ করা যায়।

প্রঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন কার্যাবলী ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

[National Human Rights Commission , Compositon, Power and Function]

উঃ ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার নামে সংযোজিত হয়েছে মানবাধিকারের এক বিশদ অধ্যায়। এছাড়াও সংবিধানের অন্যান্য অংশে মানবাধিকারের স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। প্রধানত সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট এর হাতে মানবাধিকারের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও দেখা যায় ভারতবর্ষে যে পরিমাণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে তার সামান্য অংশই আদালতের আওতায় আসে। কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষই হল দরিদ্র ও অশিক্ষিত। আদালত ছাড়াও দেশের প্রশাসন ও পুলিশের ওপর মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব থাকে অনেক পরিমানে। কিন্তু আমলা ও পুলিশ রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশ চলতেই অভ্যস্ত। ফলে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। এবং জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়। এই পটভূমিকায় ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে মানবাধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয় এবং ১৯৯৩ সালে অক্টবর মাসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

গঠন : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মোট সদস্যসংখ্যা ৪জন। কমিশনের সদস্যদে
মধ্যে থাকবেন সুপ্রিমকোর্টের একজন কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপ
হাইকোর্টের একজন কর্মরত অথবা আবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। মানবাধিকার বিষয়ে বিশেষ
২জন বিচারপতি। এছাড়াও সংখ্যালঘু ও তপশিলি জাতিদের জন্য উপজাতিদের জ
এবং মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশন প্রভৃতির সভাপতিরা পদাধিকার বলে এই কমিশনে
সদস্যপদ লাভ করেন। সদস্যদের মনোনীত করেন প্রধান মন্ত্রির সভাপতিত্বে লোকসভা
অধ্যক্ষ বা স্পিকার, কেন্দ্রর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি। লোকসভা ও রাজ্য সভার বিরোধীদলের নে
রাজ্যসভার Deputi Chairman কে নিয়ে গঠিত একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি। এই কমিটি
সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণ নিযুক্ত হলে সুপ্রিমকোর্ট
অথবা High Couart এর কোনো কর্মরত বিচারপতিকে এই কমিশনের সদস্য হিসে
নিয়োগ করার আগে ভারতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক। প্রসঙ্গ
উল্লেখ্য যে, সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রঙ্গনাথ মিত্র এই কমিশনের প্রধান সভাপ
মনোনীত হন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একজন সাধারণ সচিব থাকেন। তিনি হলে
কমিশনের প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক। কমিশনের সদরদপ্তর দিল্লিতে অবস্থিত।

সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৫বছর। অবশ্য তাদের পুনর্ণিয়োগে কোন বাধা নে
তবে কোন সদস্য একাধিকক্রমে ১০ বছরের বেশি স্বপদে আসীন থাকতে পারে ন
অন্যান্য সদস্যদের ন্যায় সভাপতিত্ব ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। তবে তার বয়স ৭০ বছ
অতিক্রম করলে তিনি আর ঐ পদে থাকতে পারেন না। কার্যকাল পরিসমাপ্তির পর কে
সদস্য বা সভাপতি কেন্দ্রিয় বা রাজ্য সরকারের অধীনে কোন চাকুরিতে নিযুক্ত হ
পারেন না। প্রমাণীত দুর্ব্যবহার ও অক্ষমতার কারণে রাষ্ট্রপতি সভাপতিসহ যেকোন সদস্য
অপসারণ করতে পারেন। তবে অপসারণের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রিমকোর্টের কাছ থে
অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে অভিমত নিতে হবে। অন্য যেসব কারণে রাষ্ট্রপতি এককভা
কোন সদস্যকে অপসারণ করতে পারেন। সেগুলি হ'ল– ১) দেউলিয়া হওয়া। ২) কমি
ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্ববেতন চাকুরি করা। ৩) মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেল
৪) নৈতিক অধঃপতনের কারণে আদালত কর্তৃক দন্ডিত হওয়া।

রাজ্যস্তরে মানবাধিকার কমিশন গঠনের ব্যাপারে অনেক টালবাহানা লক্ষ্য করা যা
তবে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৫ সালে ৩১শে জানুয়ারী মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হ
পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া হিমাচল প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এবং অসমে এখনও পর্যন্ত মানবাধিক
কমিশন গঠিত হয়েছে।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী : মানবাধিকার রক্ষা আইনের ১২নং ধারা (অনুচ্ছেদে) কমিশনের যেসব ক্ষমতা ও কার্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হল—

ক) সরকারি কর্মচারী কর্তৃক অথবা অন্যকোনো ভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন অভিযোগের তদন্ত করবে। কমিশন স্বতপ্রবৃত্ত হয়েও কোন ঘটনার তদন্ত করতে পারে।

খ) আদালতের বিচারাধীন কোন বিষয় যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত হয়, কমিশন সেক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি নিয়ে ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

গ) সংবিধানে অথবা প্রচলিত আইনে মানবাধিকার রক্ষার জন্য যেসব রক্ষাকবচগুলি আসে সেগুলির যথাযথ রূপায়নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করতে পারে।

ঘ) সেনাবাহিনী কোনো এক্তিয়ার বহির্ভূত বা অপ্রীতিকর কাজ করলে তা কমিশন খতিয়ে দেখতে পারে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে কমিশন প্রথমে সরকারের প্রতিবেদন চাইবে এবং প্রতিবেদন পাওয়ার পর কমিশন সরকারের কাছে সে সম্পর্কে সুপারিশ করবে।

ঙ) উগ্রপন্থিদের দ্বারা তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে কমিশন সেক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারে।

চ) মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি বা দলিলপত্র খতিয়ে দেখা এবং সেগুলির রূপায়নের জন্য সুপারিশ করা কমিশনের কাজের মধ্যে পরে।

জ) কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল জনসাধারণ ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে মানবাধিকার সংক্রান্ত চেতনার প্রসার ঘটানো। এ ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা, গ্রন্থ প্রকাশ করা প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করা এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত সংখাগুলিকে উৎসাহিত করা কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ঝ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করলে কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট, কেন্দ্রিয় সরকার আবার ঐ প্রতিবেদন সংসদের নিকট পেশ করবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে দেওয়ানি আদালতের সমপর্যায়ে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন—

১) সাক্ষীদের সমন করা এবং কমিশনের সামনে উপস্থিত থাকতে বাধ্য করা।

২) শপথপত্রের ভিত্তিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা।

৩) যেকোন অপিস বা আদালত থেকে সরকারী বা তার প্রতিলিপি চেয়ে পাঠানো।

প্রঃ মানবাধিকার সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা সম্পর্কে আলোচনা কর। **[Human rights and the UNO]**

উঃ ব্যক্তির সামগ্রীক সুখ-শান্তির জন্য ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সহায়ক সামাজিক অবস্থা আবশ্যক। এই অবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হলে ব্যক্তির অধিকারভোগের সুযোগ স্পষ্ট হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা UNO এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্য বিশ্ববাসীর জন্য মানবাধিকারের স্বীকৃতি একান্ত প্রয়োজন। মানবাধিকার সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে বহুদিন আগে এখন রাষ্ট্রচুক্তির মাধ্যমে নাগরিক অধিকার রক্ষায় ক্ষমতাশীল হন। তবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার আলোচনা গুরুত্বলাভ করেছে অনেক পরে। সাম্প্রতিক কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ধারণাটি ছিল সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিশ্বব্যাপী ইউরোপে অমানবিক নাৎসী অত্যাচারের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। পরপর দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীজুড়ে মানবিক সংরক্ষণ ও স্বীকৃতরি ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

UNO-এর সনদের প্রস্তাবনায় অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে ঘোষানা করা হয়েছে– 'সনদের প্রস্তাবনায় মৌলিক মানবাধিকার, মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধ এবং ছোট বড় সকল জাতির স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের ওপর আস্থা পুনস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সনদের ১৩, ৫৫, ৫৬, ৬২, ৬৮ প্রভৃতি ধারার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সকল রাষ্ট্রের উচিৎ এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতিকে অনুসরণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া। এবিষয়ে সনদের ১(৩) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্র মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। তাছাড়া মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলি উদ্যোগী হবে। সনদের ৫নং ধারানুযায়ী উল্লেখিত উদ্যেশ্যকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে UNO-র সদস্য রাষ্ট্রগুলি একক তথা যৌথভাবে সম্ভাব্য কার্যকরি সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে। সনদ এর ৬২ নং ধারানুযায়ীও এবিষয় আলোচিত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিসরের (ECO-SOC) ওপরই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। সকলের জন্য মৌলিক স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের কতগুলি মূল নীতি আছে। এই সমস্ত নীতির প্রতিশ্রদ্ধা থাকা দরকার। এবং মানবাধিকারের এই মূল নীতিগুলিকে মেনে চলা দরকার। বলা হয়েছে যে এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিসর প্রয়োজন মত সুপারিশ করবে।

সনদের ৬৮ নং ধারায় বলা হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিসর মানবাধিকার রক্ষার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কমিশন গঠন করতে পারেব। তাছাড়া UNO-র অছি (Trust) ব্যবস্থার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হল মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সংরক্ষণ করা। অছি ব্যবস্থার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সনদের ৭৬(১) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, অছি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হবে। জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে উৎসাহ প্রদান। আবার সনদের ৬৮ নং ধারায় বলা হয়েছে যে ৬৮ নং ধারানুসারে এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিসর এক্ষেত্রে প্রয়োজনমত কমিটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সনদের ১৩(১)(খ) ধারায় সাধারণ সভাকে জাতি-স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়ে সাহায্য করতে উদ্যোগী হতে ও সুপারিশ করতে বলা হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সনদের মানবিক অধিকার সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবিকাধিকারের উন্নয়নের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে। তবে সনদের ব্যবস্থাদি কোনরকম আইনমূলক দায়বদ্ধতার সৃষ্টি করতে পারেনি।

সকলের জন্য **মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার** স্বীকৃতির ব্যাপারে UNO-র সনদে উল্লেখ আছে। সুতরাং মানবিক অধিকারের সংরক্ষণের এবং প্রসারের ক্ষেত্রে UNO-র উদ্যোগ অস্বীকার করা যায় না। মানবিক সংরক্ষণের ব্যাপারে UNO-র সকল সংস্থাই অল্পবিস্তর সক্রিয়। তবে এবিষয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে উদ্যোগি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই পরিষদের একটি ক্রিয়াগত কমিশন হিসেবে গঠিত হয় মানবাধিকার সংক্রান্ত কমিশন। ১৯৯৩ সালে ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত এই কমিশনের সদস্য সংখ্যা হল ৬২ জন। এই কমিশনের সদর দপ্তর অবস্থিত জেনেভায় এই পরিষদ প্রথম মানবিক অধিকার বিষয়ক কমিশন বা Comission on Human rights 1947 এর জানুয়ারীতে। এই কমিশনের প্রধান দায়িত্ব ছিল মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘোষাণা খসড়া প্রনয়ন করা। তাছাড়া জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ বা স্ত্রী-পুরুষ বিচারে বৈষম্য প্রতিরোধ সংখ্যালঘু মানবগোষ্ঠীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা, মানবাধিকার সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে প্রস্তাব ও প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পেশ করার দায়িত্ব এই কমিশনের ন্যস্ত করা হয়।

মানবিক অধিকার বিষয়ক কমিশন সুদীর্ঘ আরাই বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণার একটি খসড়া প্রস্তুত করে। UNO-র সাধারণ সভায় তৃতীয় বার্ষিকি অধিবেশন বসে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর। সাধারণ সভার এই পরিবেশনে 'মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র' [Universal Declaration of Human rights] এর খসড়াটি গৃহিত হয়। এই অধিবেশনে ৫৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে পক্ষে ৪৮টি রাষ্ট্র ভোট দেয়।

মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণা হল নীতিবিষয় এর ঘোষণা। ঐ ঘোষণাপত্রে বিভিন্ন অধিকার ও স্বাধীনতার উল্লেখ আছে। যেগুলি কার্যকর করার ব্যাপারে সকল ব্যক্তি ও জাতির কাছে সাধারণসভা আবেদন জানিয়েছে। সাধারণসভা ১৯৪৯ সালে ডিসেম্বর মাসে ৪ তারিখে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতে প্রতিবছর ১০ই ডিসেম্বর তারিখটিকে মানবাধিকার দিবস হিসেবে উদযাপনের জন্য সকল জাতি ও সংগঠনের কাছে আবেদন জানানো হয়। তাছাড়া সাধারণসভা ১৯৪৮ সালকে মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক বছর হিসেবে ঘোষণা করে মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে। মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা এবং অভিন্ন ও অপরিহার্য অধিকারের স্বীকৃত স্বাধীনতা ন্যায় বিচার এবং বিশ্বশান্তির মূল।

প্রঃ ভারতের মানবাধিকার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা কর।
[Discuss about the Human right movement in India]

উঃ ভারতের মানবাধিকার আন্দোলনের অধিকাংশই হল শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষের অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন। এদেশের মানবিক অধিকার আন্দোলনের প্রাথমিক পরিচয় পওয়া যায় নক্সালবাড়ি আন্দোলনের সময়কাল থেকে। নক্সালদের কার্যকলাপ দমনের জন্য সরকারের তরফে নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু হয় যার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক স্বাধীনতা কমিটি গঠন করা হয়। এই সময় অত্যাচারিত শোষিত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল যার মূল বক্তব্য ছিল সমাজে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা।

১৯৭৫ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী আভ্যন্তরিন কারণের জন্য জরুরি অবস্থা জারি করেন। এই সময়ে সংবাদপত্র, রাজনৈতিক আন্দোলন ও নাগরিক অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়। রাজনৈতিক নেতা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার ও আটক আইনজারি করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণকারী আন্দোলন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আবার অনেকসময় পুলিশবাহিনী সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। ভারতের উঃ পঃ অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিশেষত কাশ্মির, মনিপুর, অরুনাচলপ্রদেশ, নাগাল্যান্ডে নিরাপত্তাহীন বাহিনীর অথ্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকরা আন্দোলন করেছে। এক্ষেত্রে কয়েকটি সংস্থার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যেমন– People's Union for Civil Liberties এই সংস্থাটির বিভিন্ন শাখা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত। এছাড়া দিল্লিতে আছে Peoples union for Democratic Rights, মুম্বাইতে আছে C.P.D.R. কলকাতা তে A.D.D.R. এছাড়াও নাগাল্যান্ডে আছে নাগা জনগণের আন্দোলন এবং গুজরাট লোক অধিকার সংঘ ইত্যাদি। স্বাধীন

ভারতে মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্দোলনকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা– ১) জরুরি অবস্থার আগের পর্যায়। ২) জরুরি অবস্থার পরবর্তী পর্যায়।

প্রথম পর্যায়ে মানবাধিকার আন্দোলনসমূহে সুসংবাদ বিবরণ পাওয়া যায় না। Communist দের ওপর রাষ্ট্রীয় পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক স্বাধীনতা কমিটি গঠন করা যায়। তবে এই নাগরিক স্বাধীনতা আন্দোলন উল্লেখযোগ্য ভাবে শুরু হয়েছে ঐ শতকের ৬০এর দশকের শেষের দিকে। এসময় নক্সালবাড়ি আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। নক্সালদের কার্যকলাপ দমন করার জন্য সরকারর নক্সালদের ওপর নিষ্ঠুর নিপিড়ন শুরু করে। এই সময় সমাজে নিপীড়িত অংশে গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহের জন্য আন্দোলন সংগঠিত হয়।

ভারতের মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্দোলনের ধারার সূত্রপাত ঘটেছে বিংশ শতাব্দির সত্তরের দশকের মাঝামাঝি ১৯৭৫ সালে ২৫শে জুন। ইন্দিরাগান্ধি অভ্যন্তরিণ কারণে জরুরি অবস্থার জারি করেন যা অব্যাহত থাকে ১৯৭৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই সময় সংবাদ পত্র, রাজনৈতিক আন্দোলন নাগরিক অধিকার প্রভৃতির ওপর অবাঞ্ছিত নিয়ন্ত্রণ জারি হয়। এই সময় দেশের বিরোধী নেতাদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়। সংবাদপত্র প্রকাশকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয় MISA আইনের ব্যবহার বেড়ে যায়। চলতে থাকে COFEPOSA এর মত আইনজারি। এর পরিনামে বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন সংস্থা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে এবং আন্দোলন সংগঠিত করেছে। সংগঠন গুলি হল– i) PUCL, ii) PUDR, iii) APDR, iv) AFDR, v) CPDR, vi) APCLC, vii) গুজরাটের লোক অধিকার সংঘ, viii) নাগাল্যান্ডের নাগা জনগণের আন্দোলন।

এই সমস্ত সংগঠন, সংস্থা, মোর্চা, মঞ্চ, গোষ্ঠী বা আন্দোলন মানবাধিকার লঙ্ঘণ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবাদে প্রস্তুত করে। মানবাধিকার আন্দোলনে সংগঠনগুলি ৬-৭জন ক্রিয়াকারীকে নিয়ে একটি প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানমূলক Team গঠন করে। এই Team সারজমিন তদন্ত করে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার যারা হয়েছে তাদের সাথে কথা বলে এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও জনমাধ্যমের সাথে কথা বলে ঐ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। এইসব প্রতিবেদন গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। এগুলি প্রকাশিত হলে জনগণের মধ্যে প্রতিকূল প্রভাব পড়ে; ফলে সরকার এই সমস্ত প্রতিবেদন গুরুত্ব দিয়ে বিচার বিবেচনা করতে বাধ্য হয়।

শিশু শ্রমিক, শিশুর অপব্যবহার, নারী নির্যাতন, চোরাই চালান, বন্দি নির্যাতন, পুলিশি হেপাজতে মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলি দ্রুত কাজ করলেও ভারতে মানবাধিকার আন্দোলন এখনও পুরোপুরি সংগঠিত ও শক্তিশালি হয়নি। তবে মানবাধিকার

সংরক্ষণেব লক্ষ্যে সংগঠিত আন্দোলনসমূহের সূচনা সন্তোষজনক এবং এর বিকাশ বিস্তার উল্লেখযোগ্য। Amesty International এর মত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সং ভারতে মানবাধিকারের বর্তমান অবস্থাকে হতাশাজনক হিসেবে বর্ণনা করে। প্রতিবে রাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারতের বিরুদ্ধে জম্মু-কাশ্মিরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থা করে। তবে বর্তমান বারতে মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি আগের মত আর অবহেলি নয়। সরকার এব্যাপারে যথাযথ সতর্ক। যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে জাতীয় মানবাধিক কমিশন এবং মানবাধিকার কমিশন সমূহের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।

ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। সংবিধান দেশের মানুষের জন্য বিভি মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহের স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনগণে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষণের জন্য বিভিন্ন মানবাধিকার আন্দোলন সংগঠিত হয়ে চলেছে তাছাড়া জনস্বার্থবিষয়ক মামলার মাধ্যমে আদালত মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সদর্থ ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া সাম্প্রতিক কাল বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা মানবি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন আশার আলো দেখিয়েছে।

প্রঃ ভারতে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ভূমিকা আলোচনা কর। ।। অথবা।। মানবাধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের ভূমিকা আলোচনা কর। [Role of Judiciary to Protection of Human Rights]

উঃ ভারতবর্ষে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সুপ্রিমকো মানবাধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে একাধিক মামলার বিচারের জন্য 'লেখা' ব 'Write' জারি করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বেআইনি পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তা করে আটক করলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ হেফাজতে অত্যাচারে আহ ব্যক্তির আর্থিক ক্ষতিপূরণ দানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় আইনি সাহায্য সহযোগিতা বিনা খরচায় দানের নির্দেশও দিয়েছেন কোর্ট।

সামাজিক ন্যায় সংক্রান্ত ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলার রায় দানের মাধ্যমে ভারতীয় বিচারবিভাগ এ বিষয়ে বহু নিয়ম, বিধি, আইন ও নির্দেশিকা প্রনয়ন করেছেন যেমন- সমগোত্রের বিবাহ করার সম্প্রতি হরিয়ানার পঞ্চায়েতের নির্দেশে পারিবারিক সম্মান রক্ষার অজুহাতে তরুন এক দম্পতিকে হত্যা করা হয়। হরিয়ানার করনালে আদালত ২০১০ সালের ২০শে মার্চ এক ঐতিহাসিক রায়ে এই হত্যার দায়ে ৫জনকে মৃত্যুদন্ড দেয়। **লতা সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ** সরকার মামলায় সুপ্রিমকোর্ট নির্দেশ দেয় যে স্বেচ্ছায় অসমর্ণ বা আন্তরধর্মীয় বিবাহ করার পর কোন কোন ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্মা

...অজুহাতে বিবাহিতদের হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া যায়। এই ধরণের হত্যার ...সম্মান রক্ষার কোন বিষয় জড়িত থাকে না। আসলে এই ধরণের হত্যাকাণ্ড হল, ...নৃশংস, বুর্জোয়া মনোভাবের ফলাফল, যার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রদান করা প্রয়োজন।

সুস্থভাবে ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার যে কোনো ব্যক্তির মৌলিক ও ...টি আবশ্যিক অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের ২১নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ...ইনের অনুমোদিত পদ্ধতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ...কে বঞ্চিত করা যায় না। এই ধারায় ব্যক্তির জীবনের যথোপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে ...কার অধিকার, সুস্থ পরিবেশে বাঁচার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকারী, জীবনযাপনের অধিকার, ...মুক্ত বায়ু ও জল ব্যবহারের অধিকার, আশ্রয় পাওয়ার অধিকার জীবিকার অধিকার ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অধিকার গুলি অন্তর্ভূক্ত। সংবিধানের এই একটি মাত্র ধারা রয়েছে, ...র ব্যাখ্যা বর্তমানে চুড়ানস্ত ব্যাপ্তি অর্জন করেছে। সুপ্রিম কোর্ট ও তার বিভিন্ন মামলার রায় দানের মাধ্যমে এই ধারণাকে আরও বিস্তৃত করেছে। যেমন- দিল্লি দূষণ মামলায় ১৯৮৯ সালে সংবিধানের ২১ নং ধারায় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, জীবনের অধিকারের মধ্যে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে, পরিবেশগত ভারসাম্যের যথাসম্ভব কম ক্ষতি ঘটিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার ও এর অন্তর্ভূক্ত। **চরণলাল সাহু বনাম ভারত সরকার** মামলার রায়ে বিচারপতি কুলদীপ সিং মৌলিক অধিকার রক্ষায় সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এই অধিকার রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

এর বাইরে জনস্বার্থ বিষয়ক আব্দেন গ্রহণে ভারতীয় বিচারবিভাগ সবসময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। ভারতীয় সংবিধানের ৩২নং ধারার অধীনে সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে জীবন ও স্বাধীনতার মৌলিক অধিকাররক্ষা এবং জনস্বার্থে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা রূপায়ণের নির্দেশ দিয়েছে। **চৈতন্য বনাম কর্নাটক সরকার** মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ২২৬নং ধারায় হাইকোর্টগুলিকে জনস্বার্থমূলক আবেদনের শুনানি গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। জনস্বার্থ বিষয়ক আবেদনগুলি মানবাধিকারের রক্ষাকবজে পরিবর্তন হয়েছে। বিহারের ভাগলপুরের বিচারাধীন অপরাধী সংক্রান্ত মামলায় জনস্বার্থ মূলক আবেদনের ভিত্তিতে আদালত মানবাধিকার রক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল। মুম্বাই ফুটপাথ বাসীদের মামলা, বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা বনাম ভারত সরকার প্রভৃতি মামলায় ওরকম আরও নিদর্শন রয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি পি.এন. ভগবতীর কথায় বলা যায় যে– "যখনই কোন ব্যক্তি, কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীভূক্ত মানুষজনের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছে এবং সেই শ্রেণী দারিদ্র, অসহায়তা, অক্ষমতা বা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারনে তার প্রতিকারের জন্য আদালতের দারস্থ হতে পারছে না, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে যে কেউ যথাযথ নির্দেশের জন্য আদালতে আবেদন করতে পারেন।" (S.P. গুপ্তা বনাম ভারত সরকার মামলা ১৯৮২)

পরিশেষে বলা যায়, ভারতে প্রশাসন, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার সুচারু বন্টনের ফলে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্ষমতার এই বন্টন এবং এর থেকে পাওয়া স্বাধীনতা, বিচারবিভাগের সক্রিয়তা বৃদ্ধি এবং আইন ও মানবাধিকারের বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আইনের শাসন না থাকলে মানবাধিকারের রূপায়ন সম্ভব নয়। সক্রিয় কার্যকারিতার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষা যে কোন সমাজেই বিচার বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। তাই বিচার বিভাগ স্বাধীন ভাবে কাজ করতে না পারলে এই ভূমিকা কিছুতেই পালন করা সম্ভব হতো না। কারণ বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভাবে আইনের নীতি ও নিরপেক্ষ যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রঃ ভারতে ক্রেতাসুরক্ষা বিষয়ে একটি টীকা লেখ।
[Discuss about the congumer Protection of India]
।।অথবা।। ক্রেতাসুরক্ষা আইনের আলোকে ক্রেতাস্বার্থ সুরক্ষার উপায় আলোচনা কর। [The Consumar Protection Acy-1986]

উঃ ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে ক্রেতাদের রক্ষা করার জন্য ১৯৮৬ সালে 'The Consumer Protection Act 1986' বা 'ক্রেতাসুরক্ষা আইন-১৯৮৬' পাশ হয়।

উদ্দেশ্য : ক্রেতা যখন কোন বিক্রেতার কাছ থেকে দ্রব্য কিনবে তখন বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতাহিসেবে নিশ্চিত পরিসেবামূলক কাজ থেকে যাতে বঞ্চিত না হয়, ক্রেতা-বিক্রেতার থেকে প্রতারিত বা শোষিত না হয় এবং ক্রম করা দ্রব্য যাতে ত্রুটিমুক্ত হয় এই সমস্তবিষয় অর্থাৎ ক্রেতাকে মুক্তি প্রদানই হল এই আইনের মূল উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রিয় ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ গঠন : কেন্দ্রিয় সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এই ধরণের পরিষদ গঠন করেন। কেন্দ্রিয় সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রি পদাধিকার বলে এই পরিষদের সভাপতি পদে দায়িত্বভার গ্রণ করেন। এই পরিষদে স্থান পায় সরকারি ও বেসরকারি সদস্যা কেন্দ্রিয়পর্ষদের সভা বছরে অন্তত একবার এবং প্রয়োজন বোধে একাধিকবার আয়োজিত হতে পারে।

কেন্দ্রিয় উপভোক্তা বা ক্রেতা পরিষদের উদ্দেশ্য বা কাজ : কেন্দ্রিয় উপভোক্তা পরিবদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হ'ল–

১) যেকোনো দ্রব্যের গুণমান, পরিমান, মূল্য, বিশুদ্ধতা ইত্যাদির সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। যাতে ক্রেতা অসৎ ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রতারিত না হয়।

২) জীবন ও সম্পত্তির পক্ষে ক্ষতিকারক এমনসব দ্রব্য বাজারী করনের ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান।

৩) ক্রেতাস্বার্থ যাতে যথাস্থানে কার্যকর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৪) ক্রেতা ও উপভোক্তাকে তার স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

৫) যেকোন দ্রব্যের মূল্য প্রতিযোগীতা মূলক সীমাক্ষেত্রে নির্ধারিত সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

৬) অসৎ ব্যবসায়ী বা বিক্রেতার শোষনের হাত থেকে ক্রতাকে সুরক্ষা দান করা।

৭) ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক জনমানুষে ব্যাপক প্রচার চালানো।

রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের গঠন : রাজ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ গঠন করা হয়। রাজ্যের উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রি (বর্তমান সাধনপান্ডে) পদাধিকার বলে এই পদের পরিষদের সভাপতি। রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয়। এছাড়াও কেন্দ্রিয় সরকার অনধিক দশজন সরকারি ও বেসরকারি সদস্য নিযুক্ত করেন। রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের সভা বছরে অন্তত দুবার হবে। তবে বিশেষ কারণে দু'বারের বেশিও হতে পারে।

রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য বা কাজ : রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রিয় পরিষদের ন্যায় যেমন—

১) যে কোন দ্রব্যের বিশুদ্ধতা, দ্রব্যের মূল্য , দ্রব্যেল গুণমান ইত্যাদি সম্পর্কে ক্রেতাকে জ্ঞাত করা।

২) যে কোন দ্রব্যের প্রতিযোগীতামূলক মূল্য সম্পর্কে ক্রেতাকে সচেতন করা।

৩) অসৎ ব্যবসায়ীদের অ-নৈতিক ও অবৈধ কাজকর্ম এবং শোষনের হাত থেকে ক্রেতাকে রক্ষা করা।

৪) উপভোক্তাকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।

৫) জীবন ও সম্পত্তির পক্ষে ক্ষতিকারক এমনসব দ্রব্যাদি বাজারিকরণের বিরুদ্ধে ক্রেতাকে সুরক্ষা দান।

৬) ক্রেতাস্বার্থ যাতে উপযুক্ত ফোরামে যথার্থ ভাবে প্রতিধ্বনিত হয় সেব্যাপারে বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি।

জেলা ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের গঠন : জেলা ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ গঠিত হয় জেলা শাসক, রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি ও বেসরকারী সদস্যদের নিয়ে। জেলা শাসক পদাধিকার বলে জেলা ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের সভাপতি। তিনি এই পরিষদে অধিবেশন আহ্বান করেন বছরে অন্তত দুবার এবং সভার কার্য পরিচালনা করেন।

উদ্দেশ্য : দ্রব্যের গুনগত মান, পরিমান, ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি যাতে বিক্রি না হয়, অসাধু ব্যবসায়ের হাত থেকে ক্রেতাদের রক্ষা করা ক্রেতার বক্তব্য উপযুক্ত স্থানে পৌছানোর ব্যবস্থা করা। এই দ্রব্যের বা বিমার প্রতিযোগীতামূলক মূল্য সম্পর্কে অবাহিত করানো, অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে ক্রেতাদের রক্ষা করা ইত্যাদি জেলা ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য।

১৯৮৬ সালে আইনের দ্বারা ক্রেতা বিবাদ প্রতিকার সংক্রান্ত সংস্থা গঠন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রতিটি জেলায় একটি করে ক্রেতা বিবাদ প্রতিকার মঞ্চ গড়ে তোলার কথা বলে, যা District Forum নামে পরিচিত। জেলা জর্জ হওয়ার মত যোগ্যতা আছে এমন ব্যক্তি একজন মহিলাসদস্যকে নিয়ে রাজ্য সরকারের নিয়োগ পরিষদের সুপারিশক্রমে জেলা ফোরামের কার্য পরিচালনা করেন। District Forum-এর যে যে বিষয়গুলি সমাধান করা যায়নি বা যার ক্ষতিপূরণ ২০ লক্ষের বেশি কিন্তু ১কোটি টাকার কম সেসব ক্ষেত্রে রাজ্য কমিশনের ক্ষমতা বা এলাকা বিস্তৃত। আর যেখানে টাকার পরিমান ১ কোটির বেশি, সেই ক্ষেত্রগুলি জাতীয় পরিষদের নজরে আনা হয়।

ভারতে এখনপর্যন্ত বেশিরভাগ ক্রেতা বা উপভোক্তা ক্রেতা সুরক্ষা আইন সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত নন এবং পরিকাঠামোগত প্রচারগত স্বল্পতার কারণে ক্রেতা সুরক্ষাবিষয়ক দপ্তরও প্রতিটি ক্রেতা বা উপভোক্তাকে সচেতন করে তুলতে সক্ষম হয় নি। তবে এই বিশ্বায়নের যুগে প্রতিটি নাগরিক যখন এই ক্রেতা সুরক্ষা আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে এবং আইন অনুযায়ী তাদের স্বার্থসুরক্ষা করবে তখনই ক্রেতাসুরক্ষা আইন সঠিক মান্যতা পাবে।